Vol. 33 | No. 3 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মিথ : ব্যক্তিস্বরূপে ও শব্দানুষঙ্গে

Volume	33
Issue	3
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বেগম আকতার কামাল
Published online	June 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i3.3
Pages	43-58
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মিথ : ব্যক্তিস্বরূপে ও শব্দানুষঙ্গে

বেগম আকতার কামাল

বিশেষ একটি নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নাস্তি-অহং-সোহংবাদী পরিক্রমণশীল ব্যক্তিস্বরূপ, আর তারই কংক্রিট-শরীর হিসেবে শব্দানুষঙ্গ, প্রচল মতের কলাকৈবল্যবাদ কিংবা ব্যক্তিবাদ—দুইকে তিনি অগ্রাহ্য করেন শিল্পগত অবস্থানের সার্বভৌমত্বে—অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতোই উচ্চারণ করেন, "মানুষ ও তার পরিমণ্ডলের মধ্যে সামঞ্জস্য আনে বলেই, আর্ট জীবনে এত অবর্জনীয় এবং সামাজিক প্রতিকূলতায় আর্ট অসম্ভব বটে। কিন্তু পরিণামে প্রতি-বেশকে ছাড়িয়ে উঠতে না পারলে, তা নিরতিশয় ব্যর্থ।"[১] তাঁর ভাবনায় সাহিত্যচিন্তা জীবনজিজ্ঞাসার অন্যতম গূঢ় জটিল প্রশ্ন হিসেবেই ধৃত হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে তাঁর ক্লাসিক-চেতন আত্মানুভূতি ও অভিজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে বিজড়িত বিবেকবোধ। অনিবার্যত তিনি নির্ধারণ করেন শিল্পীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যরূপে সেই নিয়মবদ্ধতা—'দিনানু-দৈনিক খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলো যেখানে সার্থক ও সুগ্রথিত হতে পারে।' এবং 'তা সম্ভব চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য আর সংকল্প, নিরহংকার সংকল্প'—এহ দুটি দুর্লভ গুণকে আয়ত্ত করে। এক অর্থে, বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ দশকের প্রতিবেশ, বাস্তবতার অন্তঃচাপ থেকেই এই কবি বৈশ্বিক পটভূমির সঙ্গে নিঃসঙ্গ ব্যক্তির সম্পর্কসূত্র সন্ধান করেন,—নান্দনিক বিধিমালায় ব্যাপৃত থাকেন এবং উপনীত হতে চান 'আমিত্বের' কেন্দ্রে; 'এই আমি' যতোটা অহংসুলভ, তারও অধিক চৈতন্যসম্ভূত—সদাজাগ্রত আত্মসচেতনতার চূড়ান্তরূপ। যেহেতু পরিপার্শ্ব ও মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মৌলিক শর্তটি সেখানে রয়েছে সংগুপ্ত, সে কারণে সুধীন্দ্রনাথ অবলম্বন করেন ব্যক্তিস্বরূপের একটি কেন্দ্রাভিগ-প্রত্যয়। এবং বাস্তবের নিদারুণ বিশৃঙ্খলা-নাস্তি সত্ত্বেও তা-ই হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার বিষয়, দুর্মর হয়ে ওঠে রূপের প্রাণশরীরকে পাবার তৃষ্ণা, যা শেষাবধি শব্দানুষঙ্গের মাত্রায় স্থিতপ্রাজ্ঞ হয়।

ফলে তিনি প্রথম থেকেই বিষয়বস্তুর অন্তঃশরীরে ব্যক্তিস্বরূপের অনায়াস-প্রবেশকে নিরঞ্জনরূপ দিতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এতে নির্লক্ষ্য হয় তাঁর আত্মমগ্ন হওয়ার ঝুঁকি, তাছাড়া স্বভাবতই তাঁকে হতে হয়েছে প্রকাশরূপের বিন্যাসে জটিলতর, আত্মসজাগ, কেননা ব্যক্তিস্বরূপের ক্ষেত্রটাই জটিলতর সম্বন্ধ-পরম্পরায় অব্যবহিত, বিলোড়িত, অতএব উদ্বেগাকুল। এর মধ্য দিয়েই তিনি এগিয়েছেন অন্তিক-প্রত্যয়ের যৌক্তিকতায়, অথচ ব্যক্তিস্বরূপকে রাখতে চেয়েছেন অন্যনিরপেক্ষ উজ্জীবনে বিশুদ্ধ। বুদ্ধি ও আবেগের দ্বৈতাবাস এ-সূত্র থেকেই তাঁর চিত্তে প্রবিষ্ট হয়েছে, একইসঙ্গে তাই 'স্টোয়িক' ও 'এপিক্যুরিয়ান' অভিধায়[২] বিভূষিত থাকেন। কখনও বলেন, "সৎ কবির রচনামাত্রেই তার দেশ ও কালের মুকুর",[৩] অন্যত্র বলেন, 'আবেগের প্রকাশভঙ্গিও দেশ কাল ও পাত্রের অতীত'[৪]—অর্থাৎ বিষয়ের আত্মতা নির্মাণের দায় থেকেই শিল্প তার প্রকাশরূপের কাঠামোতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে; কবিতায়-প্রবন্ধে তাই সুধীন্দ্রনাথ বিষয় হিসেবে বিবিক্তবোধকে মান্য করলেও প্রকাশগত আবেগে তিনি ইন্দ্রিয়নির্ভরতায় অনুবদ্ধ থাকেন।

যেমন, ব্যক্তিস্বরূপ সম্পর্কে প্রথমেই পরিহার করেন ব্যক্তিবাদকে, ব্যক্তিচরিত্রের লক্ষণাদিকে; তাঁর মতে, আত্মজিজ্ঞাসার উদ্যোগ থেকেই ব্যক্তিস্বরূপের উদগম ঘটে এবং 'তার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সম্পর্ক নিকট এবং অভিজ্ঞতা আত্মজিজ্ঞাসার সহচর।'[৫] অভিজ্ঞতা ব্যক্তিস্বরূপের সমান্তর নয়, তবে উভয়ের নৈকট্য বিরাজমান অর্থাৎ ব্যক্তিস্বরূপ নিষ্ক্রিয় নয়। তা শেষ পর্যন্ত যে বিষয়ী হয়ে ওঠে—এ তথ্য তাঁর চিন্তায় নানাভাবেই রয়েছে। যেমন বলেন, "প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বরূপও একটা প্রতীক। ব্যক্তির প্রবর্ধমান সত্তাই তার পটভূমি। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে একটা অবিচ্ছিন্ন বিশ্বব্যাপী দর্শনে উপনীত হওয়াই তার উদ্দেশ্য।'[৬] এখানে অন্তর্নিহিত আছে প্রতীকবাদের প্রচ্ছায়া। ব্যক্তি-স্বরূপকে প্রতীক করাটাই প্রতীকবাদের অভীষ্ট, সেখানে প্রায়শ উপমা ও উপমানের সম্পর্ক আপাতঃ দৃষ্টিতে লক্ষণীয় থাকেনা।[৭] কিন্তু সুধীন্দ্র-চেতনায় প্রতীকবাদের ছায়াসম্পাত ঐকান্তিক নয়, তিনি একটি 'অবিচ্ছিন্ন বিশ্বব্যাপী দর্শনে অভিগমনের দুশ্চর-সংকল্প' ব্যক্ত করে ভিন্নপথেই যেতে চেয়েছেন। তবে প্রতীকবাদ প্রসঙ্গটি তাঁর মিথ-প্রযুক্তির মাত্রিকতায় অবশ্যই বিবেচ্য।

ব্যক্তিস্বরূপাশ্রয়ী কবিকে অতঃপর স্বাভাবিক ভাবেই হতে হচ্ছে রূপের পূজারি, 'রূপ ব্যক্তিত্বেরই অভিব্যক্তি'—এ রকম বক্তব্য প্রায়শই প্রবন্ধাদিতে উচ্চারিত হতে থাকে। এই রূপ নিছক কলাকৌশলগত ব্যাপার নয়, তার পরিপুষ্টি ঘটে সমগ্র জীবনের প্রেক্ষাপটে এবং তা শিল্পে প্রাণসঞ্চারকের ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে, তাঁর কবিতার নিবিষ্টপাঠক লক্ষ করেন একজাতীয় 'অনিকেত স্বৈরবৃত্তময় প্রবর্তনা', যদিও বহির্বৃত্তে কবিতার গঠনরূপটি থাকে সংহত, অলঙ্কৃত। ব্যক্তি-স্বরূপের মাত্রিকতা, বিন্যাস ও অন্তর্বয়নের প্রকল্পনায় বিমণ্ডিত এই যে নান্দনিক দৃষ্টিকোণ, তা-ই আত্মবিলোপের সাধনাকে স্বীকৃতি দেয় এবং অভিজ্ঞতার বিলয় ঘটাতে চায় কাব্যগত অভিজ্ঞতার গর্ভে। অন্যদিকে সচেতন মানসে এই কবি বিশ্বস্ত যে, শিল্পীর কোন দৈব-প্রতিভা নেই, শিল্পীমাত্রই সমাজ-সভ্যতায় প্রত্যক্ষ-সংযোগে বিধৃত এবং 'শিল্পোৎকর্ষের অনন্য পরীক্ষা সাময়িক জীবনের কষ্টিপাথরে তার যোগ্যতা কষে দেখা,' তখন নিরন্তর শ্রমশীলতায় অঙ্গীকৃত হয়ে উঠেন। অঙ্গীকার কোন ক্রমেই কবিকে বিবিক্ত থাকতে দেয় না, একটি সমগ্রতার অভিশ্রুতিতে তাঁকে দায়িত্ববান করে তোলে। উপরন্তু কবিতা চিন্তার বাহক কিন্তু চালক নয় বলে সুধীন্দ্রনাথের যে ধারণা,[৮] তাতে কবিতার অবয়ব শ্রমশীলতার অঙ্গীকারে আরও বেশী একান্ত হতে চায়। তিনি সর্বদাই ভেবেছেন কবিতার গঠন নিয়ে, "গঠন : সাম্যবাদী : যে কবিতাগুলি গঠনের নিয়ম মেনে চলে তাদের সকলের ভিতরেই একটা বিশিষ্ট ঐক্য আছে। এই ঐক্য আয়তিতে, জ্যোর্তিলোকে যেমন একটা বাঁধাবাঁধি পরিমাপ আছে, কোনো তারাই তার চেয়ে বেশী বড় বা বেশী ছোট হতে পারো না, তেমনি কাব্যলোকেও দৈর্ঘ্য- ক্ষুদ্রতার একটা সীমানা থাকা বাঞ্ছনীয়।"[৯] অর্থাৎ ব্যক্তি সত্তার প্রবর্ধমান বিকাশকে বৈশ্বিক পট-ভূমিধৃত করলেও সুধীন্দ্রনাথ প্রকাশরূপের ক্ষেত্রে জৈবিক-ঐক্যের অনুসারী তথা ধ্রুপদরীতির আনুগত্যে আশ্বস্ত। কেননা তাঁর আমিত্ব বা আত্মতা পূর্বাপর একই রকম, তা দ্বান্দ্বিক ন্যায়ের অনুক্রমে উদ্বর্তিত হয়ে গুণাত্মক হচ্ছেনা বরং তা হয়ে থাকছে মানুষের রোমান্টিক বেদনাবৃত্তিরই একরকম নিঃসরণ—যার উৎসমূলে দণ্ডায়মান একক একটি ব্যক্তি—বৈদগ্ধ্যে, আভি-জাত্যে, বিংশ শতাব্দীর সমান বয়স্কতায়। এর ফলে কাব্যিক নির্মাণের প্রশ্নে প্রধান হয়ে ওঠে ব্যক্তিস্বরূপের আত্মসমুখ প্রকাশ, স্থিরত্ব, স্বজার

নির্ভরতা। তাঁর ব্যক্তিময়তার কিংবা কবিতার তাই দ্বান্দ্বিকতায় পরিবৃদ্ধি ঘটেনা, তা ক্রমেই কেন্দ্রের অভিমুখে জৈবিক-ঐক্যের সাযুজ্যে পরিশীলিত হতে থাকে। নতুন নতুন মুখোশে সুধীন্দ্রনাথের রূপরূপান্তরকে লাভ করা যায়না বলেই চৈতন্যের অবৈকল্য-নির্মাণের প্রতিজ্ঞায় তাঁর অনমনীয়ত্ব চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

তথাপি জিজ্ঞাস্য, তাঁর কবিতার শব্দজগতে যে একটি অন্তঃশীল দ্বন্দ্বময় প্রবাহ লক্ষ করা যায়, তার স্বরূপটি কি। শাব্দিক ছবির যে-দ্বন্দ্বময়তায় সুধীন্দ্রকবিতা মূর্ত, তার কার্যকারণটা নান্দনিক সমস্যার অন্তর্গত। তিনি যখন আবেগ ও বুদ্ধিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করান, যখন কবিতাকে চিত্রময় না বলে চিন্তাপ্রধান বলে আখ্যায়িত করেন, অলঙ্কারকে চিন্তা-প্রাধান্যের প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে চান, তখনই সমস্যাটা দেখা দেয়। যে হেতু অন্যঅর্থে তাঁর ধারণায় প্রতীকবাদের একটি মাত্রা বিদ্যমান থেকেই যায় শিল্পিত অনুধ্যান সেখানে কবিতাকে চিত্রময়তার দিকেই নিয়ে যেতে চায়—অন্তত যখন তিনি বলেন, 'ব্যক্তিস্বরূপও একটা প্রতীক' এবং আত্মসত্তাকে ভাবেন তার ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু আবার অভিজ্ঞতার নির্যাসই কাম্য হয়ে ওঠে বলে মনন ও কাব্যগত অভিজ্ঞতার জন্মান্তরও ঘটে তার মধ্য থেকেই; সুধীন্দ্রনাথকে সেহেতু নান্দনিক-প্রক্রিয়ার সমাধান খুঁজতে হয়েছে শব্দজগতে। শব্দানুষঙ্গের প্রযুক্তি দিয়েই তিনি তাঁর ব্যক্ত দর্শনচিন্তা ও অব্যক্ত ভাববাদকে স্থিতিস্থাপকতা দিতে চেয়েছিলেন। স্পষ্ট করেই বলেন, চৈতন্যের সার্বভৌমত্ব ও অবিনশ্বরের মুখাপেক্ষী অভিজ্ঞতার যেসব নির্যাস, সেক্ষেত্রে "ভাষাই ঘটনাবহ এবং ভাষা যে শুধু ধ্বনিরূপ প্রচণ্ড উদ্দীপকের আধার তাই নয়, সভ্য মানুষের পক্ষে শব্দ আর বস্তু প্রায় অভেদাত্মা। সুতরাং কাব্যরচনা উপলক্ষে কোনও অলৌকিক প্রেরণা কবিকে পেয়ে বসেনা। তিনি অভিধানে এমন শব্দরূপ, এমন ধ্বনিতরঙ্গ খোঁজেন, যা তাঁর মৌল-উদ্বোধনের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহার্য এবং কবিতা তখনই সার্থকতার পর্যায়ে ওঠে যখন অবশ্যম্ভাবী বাক্যবিন্যাসের সংঘাতে কবিতার শরীরে ঈপ্সিত আবেগের পুনরাভিনয় চলতে থাকে।"[১০]

ভাষাগত তাৎপর্যের এ-সূত্র থেকেই আভিধানিক, অপ্রচলিত শব্দের গ্রন্থনায় পাশাপাশি মিথকে তিনি পরিগ্রহণ করেন—স্বতঃচালনাবশত। মানবসভ্যতার ভাষাভিত্তিক কাঠামোর ভেতরের রূপটি মিথের মধ্যেই

প্রোথিত হয়ে আছে, আর মিথ হচ্ছে পরবর্তীকালের কবিদের হাতে ব্যবহৃত তৃতীয় সিগন্যালের মত, যা দিয়ে সংকেতিত হয় তার পরাব্যক্তিক বিশ্ব। প্রখর আত্মসচেতন বুদ্ধিবৃত্তির পরিচর্যায় কবিতার প্রাণকে রূপের শরীরে ধরবার যে-প্রয়াস তিনি করেন, তা সমাধ্য হয় কতিপয় পৌরাণিক চরিত্র পাত্রকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে, অনেকাংশে হয় মিথকে অনুষঙ্গরূপে প্রয়োগ করে। ফলে মিথব্যবহারে তিনি মনস্তাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক, এমনকি সাংস্কৃতিক তত্ত্বভিত্তির আনুগত্য সচেতন-অর্থে মেনে নেননা, কিংবা চিন্তা-কাঠামোর বিন্যাসেও মিথস্ক্রিয়ার অন্তর্দীপনে নিমগ্ন হননা। তাঁর কবিতায় মিথ প্রযুক্ত হয় রূপগত পরিচর্যার নিয়মবদ্ধতায়, তবে তা আত্মপরীক্ষণকে—বিষয়ীর আত্মতাকে রূপের সঙ্গে আশ্লিষ্ট করে তোলে, ফলে বহুলাঙ্গ-অনুষঙ্গে এর আসঞ্জন নিষ্পন্ন হয়। সুধীন্দ্রনাথ 'ইমোশনাল কনটেন্টেই' দর্শন-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে এনে গড়তে চেয়েছিলেন একটি বিসৃষ্টিবাদের (specialisation) ধারা, চেয়েছিলেন প্রতীকপাত্রে আত্মতার তথা ব্যক্তি-স্বরূপের সারাৎসারকে একটি নির্বিকল্পরূপ দিতে, ফলে মিথ-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শেষাবধি একাংশে পর্যবসিত হয়েছে ব্যক্তিস্বরূপের প্রতিকৃতি তথা প্রতীকে, অন্যদিকে শব্দের অন্তঃশীল-আবেগ, সমাবেশ ও ধ্বনিবৈচিত্র্যের প্রাণসঞ্চারণ-ঘটানোর রূপকল্পে।

ব্যক্তিস্বরূপে মিথ-প্রতীক

সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বরূপের ধারণাকে অভিহিত করেন 'দ্বন্দ্ববিমুখ'[১১]; তাই বাধ্যত তিনি মিথ-উপাদানের দ্ব্যর্থক, রূপকধর্মী লক্ষণকে নিষ্কাশন করে ফেলেন—এমনকি মিথের কাঠামোচ্যুত করেই তাঁর প্রতীক-গঠনের প্রয়াসটি বিকশিত হয় এবং এক্ষেত্রে আত্মময় ব্যক্তিকতার যেসব পুরাণ-পাত্র তাঁকে আকৃষ্ট করে সেগুলো সংগ্রমশীল উজ্জীবন-সূচক এবং নিরন্তর ধাবমানতায় বিদ্ধ, একইসঙ্গে তারা প্রাতিস্বিকতায় বক্র, জটিলতায় কৌণিক, অথচ প্রতীকবাদী কবিদের ক্ষেত্রে প্রায়শ লক্ষণীয়; তারা নিষ্ক্রিয়তায় চৈতন্যের ভারে পঙ্গু-আত্মার প্রতীকসন্ধানে অক্লান্ত। ভগ্নপক্ষ আলবাট্রস, ইকারাস, তুষারহ্রদে বন্দী শ্বেতহংস, নার্সিসাস—এসবই তাদের প্রতীক-উপাদানরূপে বহুলাঙ্গ হয়ে ওঠে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সাধনা ও সিদ্ধির প্রতিভূ হিসেবে ব্যক্তিকে দাঁড় করান, বীরত্বের মিথকাহিনী সন্ধান করেন, পৌরাণিক অভিযাত্রা তাঁর হাতে আধুনিক-মনস্ক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির মননব্রত

হয়ে ওঠে, কেননা তাঁর বিশ্বাস, "সেই চিন্তাই গরীয়ান যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নিজের অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয়।"[১২] সংঘাতই মুখ্য, অপরিত্যাজ্য হয়ে জেশন, যযাতি—এসব মিথচরিত্রের প্রতিকৃতির মধ্যে যাথার্থ্য রচনা করে। প্রসঙ্গত, এতথ্যও স্মর্তব্য যে, সুধীন্দ্রনাথের এই রকম চিন্তাকাঠামোতে রয়েছে যে-বৃত্তস্থ কেন্দ্রবিন্দুর দিকে গমনশীলতার প্রতর্ক—বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে তিনি যাননা বলে মিথ-কাহিনীর সেইসব উপাদান-ঘটনায় উন্মুখ থাকেন, যেগুলোতে বিধৃত আছে ব্যক্তির একক-প্রয়াস বা বিশোধন, অভীপ্ট-সন্ধানে শ্রমশীল প্রজ্ঞা, তবে তা সংঘাতসংকুল, পর্যাকুল, কখনও বা কূটৈষণায় বৃত, চিন্তাকীট দংশনে জর্জরিত।

দ্বিতীয়ত, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের ক্রিয়াপটে ঘটমান বর্তমান ছাড়া অন্যকোন কালভেদ নেই এবং বর্তমান ভূত-ভবিষ্যতের ক্রমান্বয়ী সংঘর্ষ, অর্থাৎ তার ধর্মে 'গতি আর স্থিতি এক'। ব্যক্তিসত্তার এই কেন্দ্রাভিগতার একপর্যায়ে তিনি (যেমন, 'কুন্দসী' কাব্যের 'প্রত্যাখ্যান' কবিতা) ঐতিহ্য ও কর্মস্রোত-রহিত এক অনুষঙ্গহীন, স্মৃতিবিহীন চৈতন্যের গভীরে যেতে চেয়েছেন, "পদাহত ব্রহ্মাণ্ড আবার/ ডুবে যাক আচম্বিতে অনাদি অমায়॥" অথবা 'মৃত্যু' কবিতায় মানুষের বিশুদ্ধ জাগরণকে সন্ধান করেছেন প্রাকৃতির আদিমতার উৎসে—যেখানে 'নগণ্যের অভীপ্সারে প্রতিহত করে/এখনও দিগন্তে সেথা পরিচ্ছিন্ন হিমাদ্রি বিরাজে।' এ-প্রয়াস ইতিহাস চেতনার ঋদ্ধিজাত নয়, বরং তাঁর চিন্তাকাঠামোর সংঘাতশীল আবর্ত-ময়তারই বিক্ষেপ মাত্র। ইতোপূর্বে ইতিহাসের বিস্তৃত দেশকালপটে তাঁর একাকীত্ব চরম উদ্বেগাকুল রূপ নিয়েছিল, অভিজ্ঞতায় সে-একাকীত্ব নঞর্থকবোধের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়ে গেছে—যেখানে বিষ্ণু দে ইতিহাসবোধে ক্রমসংগঠন করেন ব্যক্তিতাকে, জীবনানন্দ দাশ যেখানে ঐতিহ্যের প্রবাহে মহাপৃথিবীর পথে ভ্রাম্যমান হয়ে উঠেন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অবশ্যই ঘোরতর সংকটকাল ও সংক্রান্তি রয়েছে—ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদের উত্থান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বর্বরতা, পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞ, প্রতিরোধমূলক সম্মেলনাদি—এসবই তাঁর জীবদ্দশায় লব্ধ অভিজ্ঞতা, কিন্তু তিনি স্বমুখীন-অনুভবে কবিতার স্বয়ম্ভর-রূপটির প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকেন বলে আমিত্ব-বিজড়িত থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিক-দায়িত্ববোধের ঝোঁক থেকে সরে যান না। বরং চরম-অসদ্ভাবমূলক অবস্থানে প্রান্তিক হয়ে উঠেন। সভ্যতার অন্তর্যন্ত্রণাকে ব্যক্তিক-অন্তপীড়ায় সম্পৃক্ত করবার

এ-সূত্রই তাঁর কবিতা লিখনের প্রক্রিয়ায় প্রাণবন্ত হয়, তাঁর বিষয়ের দৈশিকতায় পরিণত হয়। সর্বদাই তিনি যথার্থ হয়ে উঠেন তখনই, যখন ধ্রুপদ-কাব্যানুশাসনের অনুমোদনকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন—ব্যক্তিকতার অন্তর্প্রকাশ অথবা নিষ্কাশন যেখানে সহজেই পেয়ে যায় একটি বিশ্লেষণাত্মক পটভূমি। অন্যদিকে লক্ষ করি, তিনি নির্বেদের চূড়ায় দাঁড়িয়েও অনুপুঙ্খ-শ্লেষজর্জরতার হাত থেকে মুক্তি পাননা—এই যন্ত্রণা থেকেই আত্মত্রাণের লক্ষ্যে উচ্চারিত হয়, যে-ব্যক্তিস্বরূপ তখনই তার পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়, যদি সে বিশ্বমানবের মধ্যে নিঃশেষ মগ্ন হয়।[১৩] এ বক্তব্যে বিষয়ের আত্মতা তৈরীর কোন প্রকল্প তৈরী হয় না, বরং তা ব্যক্তিস্বরূপেরই নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জনের একটি মাধ্যমে পর্যবসিত হয় মাত্র। সুধীন্দ্রনাথ নৈর্ব্যক্তিকতার সূত্র ধারণ করেছেন এই-তাৎপর্যেই। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি বিষ্ণু দে'র মতো দ্বান্দ্বিক-ন্যায়ের বিশ্বপটে ব্যক্তিগতকে সমষ্টির সত্তা নামক মূর্ততায় মেশাতে চাননি, ব্যক্তিকে চাপা দিয়ে সমষ্টির সাম্য গড়ায় তিনি মৌলিক অর্থেই বিদ্বিষ্ট। অথচ ধ্রুপদরীতির বন্ধন মেনে নিয়ে তাঁকে সর্বদাই বিষয়ের কাছে বিষয়ীর আত্মোৎসর্জনকে, 'নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটিকে' ধরতে হয়েছে—সুধীন্দ্র-কবিতার কাঠামোগত বিন্যাসের মূলসূত্রটা এখানেই বিরাজিত। ফলে তিনি তাঁর ব্যক্তিস্বরূপকে নানামুখী ভাবানুষঙ্গবাহী কবিতার রূপবন্ধ দিয়েই স্বপ্রতিষ্ঠ করেন। যেভাবে তাঁর হাতে শূন্য হয়ে উঠে অনেকান্ত-তাৎপর্যমণ্ডিত, যেভাবে তিনি সদাজাগ্রত সংবিতে ধারণ করেন ব্যক্তির ক্ষুদ্রতা-সীমাবদ্ধতা-বিদ্রূপময় অবস্থান, তাতে যুক্তিবোধের গ্রন্থনাটি বিসর্পিল হয় ও তাতে বহুলাঙ্গ-রূপটি হয়ে উঠে গতিশীল, আঁকাবাঁকা, মোড়বহুল।[১৪]

তাঁর বিষয় অনেকান্ত, অথচ সেই বিষয়ের দৈশিকতা (space) সর্বদাই থাকে বৃত্তের কেন্দ্রানুগ, পাত্রও 'বিংশশতাব্দীর সমান-বয়সী' চৈতন্যবোধে স্বয়ম্ভর, আর সময় প্রবহমান হয়েও স্থিরতর—এরকম একটি পরিমণ্ডল তাঁর কবিতার সংগঠন-অবয়বে অনুস্যূত থাকে বলে মিথপ্রতীকই হয় তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের যোগ্যপ্রতিমা। আর এ তথ্যতো সত্য যে, সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তি কোন পরাব্যক্তিক শক্তির অভিপ্রকাশ নয়, তাকে বলা যাবেনা বুর্জোয়া-সুলভ অবক্ষয়ের বিকার। এই-ব্যক্তিতা যুক্তিক্রমের প্রতর্কে, বৈদগ্ধ্য-মণ্ডিত ব্যক্তিত্বের অভিলাষ-সাপেক্ষ এবং একটি আত্ম-পরিক্রমণরত জটিলতার স্বনিরূপিত-প্রতীকায়ন।

এ ব্যাখ্যায় তাঁর চেতনার প্রতীকমুখ্য-ধারণাকে আমরা বিশেষীকৃত অবস্থায় পাইনা, বরং নির্বিশেষ-রূপের অভিমুখী হতে দেখি—যেখানে প্রতীকবাদকে মনে হয় মনোবিদ্যার দ্বারা প্রভাবান্বিত,[১৫] এবং আরও মনে হয় প্রতীকবাদী কবি মালার্মের প্রতি সাহমর্ম অনুভব সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে পার্থক্যের সূত্রটি কেন গড়ে ওঠে। মালার্মে চিত্র-প্রধান কাব্যরচনাধারায় প্রতীকের একটি অনাত্মরূপ গড়তে চেয়েছিলেন—যা হবে আপাত দৃষ্ট প্রপঞ্চ বা ফেনোমেনার ঊর্ধ্ব পরমত্ব ধারণের অভিজ্ঞান; তাঁর ধারণা ছিল এই অনাত্মরূপই কবিতাকে অনর্থসূচকতার ভারমুক্ত করবে। এক পর্যায়ে এপথে তাঁকে মগ্ন হতে হয় মন্ত্রবাদে, স্বপ্নপূজার পন্থায়—যাতে মন্ত্রধ্বনির ইন্দ্রজাল, সঙ্গীতযোজনার অনির্বচনীয়ত্ব অশেষরেশের মধ্য দিয়ে বস্তুর রূপায়ণকে ধরতে পারবে। কিন্তু মালার্মের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের পার্থক্য মৌলিক। যদিও কাব্যালোচনায় তাঁর ঝোঁকটা লক্ষ করা যায় ফরাসী-প্রতীকী কবিতার দিকেই, প্রকৃত পক্ষে সুধীন্দ্রনাথ চিন্তা-প্রাধান্যে গঠিত, বুদ্ধিবাদে আসক্ত, চিন্তার উপায়স্বরূপ ভাষার অস্তিত্ব তাৎপর্য পায়—বিষয়বস্তুরই রূপগত অভিক্ষেপ সেখানে সার্বভৌম। তদুপরি বাংলা শব্দের ঝোঁকটাও পড়ে শব্দের প্রত্যক্ষ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ অভিধার দিকে—সেখানে প্রতীকের কুহক বা সঙ্গীতময়তার রেশ বস্তুরূপায়ণকে বরং অপ্রত্যক্ষই করে। যদিও 'দশমী' কাব্যে প্রতীকপন্থার কিছু লক্ষণ বিদ্যমান, অন্যত্র তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, যযাতি জেশন কিংবা কৃষ্ণ—এসব আত্মপ্রতীক ক্রমেই প্রতীকপন্থার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যায়—আর্কেটাইপের অন্তঃশরীরকে রক্তসঞ্চালনক্রিয়ার মতো গূঢ়তর করে তোলে ক্রমেই সুধীন্দ্রনাথ প্রতীকগুলোকে চিত্রকল্প, রূপক-উৎপ্রেক্ষার স্বভাবানুগ করে তোলেন।

'যযাতি' প্রতীকে তাঁর প্রতীক-ব্যবহারের আন্তঃসঙ্গতিও নিরূপিত। ব্যক্তিস্বরূপের প্রতিকৃতির মধ্যে অভিজ্ঞতার বিলয় ঘটিয়ে তিনি বিশ্বপটকে ধরতে চান—এ তথ্য পূর্বেই বলা হয়েছে। এ-লক্ষ্যে বিষয়াশ্রয় ও অনুভূতিপুঞ্জের মধ্যে অনিবার্য বিমিশ্রণ ঘটে, আবার পাশাপাশি তাতে সঞ্চার করতে হয় প্রবহমানতা ও গতিময়তা। পৌরাণিক ঘটনাচিত্রের ইঙ্গিতে-সংকেতে সুধীন্দ্রনাথ বক্তব্যের সামগ্রিক পারবশ্য কার্যকর করেই উক্ত বিমিশ্রণ ঘটান—যা লক্ষণীয় জেশন, যযাতি চরিত্রপাত্রের সঙ্গে আত্মবিনিময়ের যে-রূপটি তিনি কবিতায় নির্মাণ করেছেন।

'যযাতি' প্রতীকে আত্মপ্রতিকৃতির নানা কোণ অনুসন্ধেয় হয়ে উঠেছে—"যযাতির প্রচ্ছদে বিংশশতাব্দীর 'অকপটতার' সাধক কবি চৈতন্যবান মানুষের মূর্তিই সেখানে প্রকাশিত।"[১৬] ব্যক্ত হয়েছে মানুষের বিবিক্ত-জনিত বিষাদ, আত্মবিলোপের বিবাদ। একই সূত্রে দৈশিকতার সংযোগ ঘটে সমসাময়িক রাজনীতি-প্রসঙ্গের আবহসঞ্চারের মধ্য দিয়ে। র‍্যাঁবোর স্বপ্নভঙ্গজনিত বিরতি—শর্মিষ্ঠা দেবযানীর কলহ-সংকেত—সব কিছুই ব্যক্তির আত্মিক অভিক্ষেপকে প্রতীকায়িত করছে—একেই বলা হচ্ছে বিষয়াশ্রয়ে অনুভূতিপুঞ্জের আবেশন এবং শেষত সামগ্রিকতার ঐক্য। আত্মজৈবনিক পর্যবেক্ষণ বির্তক-বিসম্বাদ—সবকিছু এভাবেই শিল্পময়ত্ব অর্জন করে। এখানে প্রযুক্তিটি প্রাকরণিক বিনির্মাণে অনুসরণ করে কবির কাব্যরীতির অনুশাসনকে, অর্থাৎ এমন একটি নাট্যগুণ-সমন্বিত তাৎপর্যের বিকীরণ ঘটে যেখানে ফলদায়ক হয়ে উঠে সুধীন্দ্রনাথের ছন্দ-ব্যবহারে অন্ত্যানুপ্রাস-সৃষ্টির পারম্পর্য, নিঃশব্দধ্বনিগাম্ভীর্য, এমনকি তাঁর প্রসিদ্ধ ধ্বনিপরিমিতির অন্তর্বয়ন—যা কবি অবচেতনভেদ্য করেন অন্ত্যানুপ্রাসকে পদমধ্যস্থ অবস্থানে সংযোজনের মধ্য দিয়ে।

এরকম বৈশিষ্ট্য লক্ষযোগ্য পূর্ববর্তী 'জেশন' কবিতায় (দ্রষ্টব্য, 'সংবর্ত' কাব্য)। সেখানেও তিনি ধারাবাহিক আখ্যানের পৌরাণিক অনুক্রম গ্রহণ করেন নি; পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গাদি ও অনুষঙ্গকে ঐকতায়, রসসত্তার অনিবার্য অঙ্গসংস্থান হিসেবে অপরিহার্য করেন। এভাবেই তাঁর কবিতায় মিথ প্রতীকী-ব্যবহারের বিশিষ্টতা অর্জন করে। 'জেশন'-এ তাই অন্তর্জীবনের নাট্য এসে ক্রমে প্রতীকায়িত হয়েছে চৈতন্যবান, আত্মসংগ্রামশীল ব্যক্তির জীবন-নাট্যের পটভূমে। জড়বিশ্বের সঙ্গে চৈতন্যের অবিরাম যে যুদ্ধ চালনার প্রসঙ্গে-ঋদ্ধ কবিতাটি—যা নিরন্তর, চিরায়ত ব্যাপার, তারই সূত্রে সাঁতার-নৌচালনার চিত্রকল্প সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় পৌনঃপুনিক হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ মিথপ্রতীক চিত্রকল্পের সংস্পর্শেই উজ্জীবিত হয়, কারণ মননশীল সচেতন অভিজ্ঞতার নির্যাস অতিসহজেই শরীরীরূপ পায় উক্ত নৌচালনা-সাঁতার জাতীয় ইমেজের অবয়বে।

আলোচ্য মিথপ্রতীক দুটো বহিরঙ্গে ধারণ করছে জগতের ভার-সাম্যহীনতার প্রসঙ্গ, মানবজীবনের বিসঙ্গতির চিত্র, আর অন্তর্গতরূপে

এর অভ্যন্তরে রয়েছে ব্যক্তির কাম্যবিশ্ব, তার ব্রতযাত্রার সংকল্প, ভারসাম্যলাভের জন্য তার গভীর অভিলাষ, অথবা যে-সমন্বয়ের সূত্র-সন্ধানে তার উৎকণ্ঠা—তার লজিক্যাল-ভিত্তি—'অনন্তের পটে স্বপ্নের মতো ব্যক্তিস্বরূপের প্রকল্পকে ফুটিয়ে তোলার' ধ্যান। আমরা প্রতীক দুটোর মধ্যে সেই অবলুপ্ত সঙ্গতিকে পাই, যৌক্তিক-বিন্যাসকে পাই, যেখানে পুরাণ লুপ্ত-অনুষঙ্গের আবহকে আধুনিকত্বে ফিরিয়ে আনতে উদগ্রীব, সংশয় আর নাস্তির পটে যেখানে হারিয়ে-যাওয়া বিস্মৃত-প্রায় সম্পর্ক-পরম্পরার প্রত্যয়গুলো পুনঃজাগরণে প্রত্যাশী। তবে এ-জাগরণ যেহেতু কবির কলাকৌশলগত অভিপ্রায়ের অন্তর্ভূত, সেহেতু বিচ্যুতি-বিকৃতির (distortion) মধ্য দিয়েই ঘটে অর্থের রূপান্তরণ-ক্রিয়া। এবং তাতে কবির মনের গর্ভে অন্তর্নিহিত আর্কেটাইপগুলোর এক ধরনের পুনরুজ্জীবন সাধিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করা যায় 'রাখাল' প্রতীকটির কথা। রাখাল কৃষ্ণের প্রতিমাটির অধিষ্ঠান তাঁর সংস্কার-চেতনায় বিশেষভাবেই অস্তিত্ববহ ছিল বলে মনে হয়, যেজন্য প্রতীকটি তির্যক-বক্তব্যের যুক্তিন্যায়ের পথে আসেনা—যেভাবে আসে যযাতি, জেশন অথবা উর্বশী। এ-প্রতিমাটি কবিতায় ব্যবহৃত হয় অনেকটা 'মননসমৃদ্ধ অবিশ্বাসের বিষয়াশ্রয়কে' স্বতঃস্ফূর্ত-টানে মূর্ত করার অভিলাষে। ফলে সুধীন্দ্রনাথ শেষত মিথের আর্কেটাইপধর্মী বিবেচনার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন বলে মনে হয়। তবে এগিয়েছেন তাঁর কাব্যকৌশলগত কাঠামোর দ্বন্দ্বজটিল অবয়বটিকে তাৎপর্যবহ করেই।

যেমন, চেতনার অন্তঃস্থলে আর্কেটাইপের জাগরণকে বাধ্যত সংযুক্ত করতে হয় মনন-প্রযোজনায়—কারণ তিনি চিন্তাপ্রাধান্যে বিমণ্ডিত। হিন্দুপুরাণে কৃষ্ণের তাৎপর্য হচ্ছে রাখালবেশধারী বিশ্বের রক্ষক হিসেবে, আবার বংশীধারী এই রাখাল আমাদের চৈতন্যে সৌন্দর্যপ্রিয়তায়ও সংলগ্ন। অধ্যাত্মচেতনামণ্ডিত এই রাখালবেশী কৃষ্ণ একই সঙ্গে মহাকাল, বিনাশ আর সৌন্দর্যবিভার প্রতিমূর্তি। সুধীন্দ্রকবিতায়—দ্রষ্টব্য 'নৌকা ডুবি' কবিতাটি, রাখালের অধ্যাত্মবেশ খণ্ডিত, ব্যঙ্গার্থে বিদ্ধ, কিন্তু সৌন্দর্যবিভাটি অক্ষুণ্ণ রয়ে যায়। তিনি বিষয়ের লক্ষভেদে প্রতীককে খোঁজেন, ব্যবহার করেন ব্যাধের মতই ; তাই উপমার সন্ধানই এক্ষেত্রে হয়ে ওঠে অন্তিক। আর একথাও তো অবধারিত—তাঁর

ক্ষেত্রে যে, অভিজ্ঞতা মাত্রেই আত্মপ্রকাশে বাধ্য এবং আত্মপ্রকাশ একটি ভাষাগত ব্যাপার—ব্যক্তিগত-জাতিগত সংস্কারের দর্পণ ব্যতীত তার বাক্যস্ফূর্তি ঘটে না। এই তাগিদেই সুধীন্দ্রনাথ একটি শিল্পবীক্ষা তৈরীতে অগ্রসর হয়েছেন—যে-বীক্ষাটি নানা উপাদানে আকীর্ণ, তবে কোন রকম পূর্ণ-সংহতিতে আসঙ্গিত নয় বরং বহুধা-বিভক্ত। কবিতায় মিথ আসে এই বিভক্তকৃত ক্ষেত্রগুলোর বিচিত্র বর্ণসম্পাতে রঞ্জিত হয়ে—সেখানে ব্যক্তিজীবন, যুগ ও কালের ভ্রূহস্পর্শটি থাকে সব সময়ই পর্যাকুল।

শব্দানুষঙ্গে মিথ

অভিজ্ঞতা মাত্রেই প্রবহমান, স্মৃতিনির্ভর, এবং স্মৃতিমাত্রেই অনুষঙ্গযুক্ত ও ইন্দ্রিয়ময়। চিত্রকল্প রচনার মূলেও থাকে অনুষঙ্গের মননভিত্তিক সক্রিয়তা। অভিজ্ঞতাশ্রয়ী সুধীন্দ্রনাথ মিথের অনুষঙ্গে বহুলাঙ্গ হতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে রূপনৈপুণ্যের দ্বারস্থ হন। অভিজাতমনন যখন সমাজ-বোধের গূঢ়সম্বন্ধ দ্বারা ভাবিত না হয়, তখনই প্রবল ব্যক্তিস্বরূপের অন্বেষণ তাকে পরিচালিত করে শব্দধ্বনির দিকে।

আগেই লক্ষ করা গেছে, তিনি প্রচলিত শব্দের বিপরীতে অবস্থান-গ্রহণে যথাসম্ভব সতর্ক—কারণ তাতে সহজ একটি গতি-প্রবাহের ও বিদ্যমান-রূপের পারবশ্য মানতে হয়। সচেতন অর্থেই এ-প্রবাহ তিনি এড়াতে চেয়েছেন। এ-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে অপ্রচলিত শব্দরাজি। তবে, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, তিনি কবিতাকে ভাবতেন মর্যাদা সম্পন্ন শিল্প হিসেবে এবং সে-মর্যাদা অর্জিত হতে পারে কেবলমাত্র শব্দ ব্যবহারের অভিনবত্বে। অর্থাৎ তাঁর শিল্প-চিন্তার গঠনটাই ইতি-নেতির দোলাচলে আন্দোলিত, আবার এই আন্দোলনকে তিনি প্রকরণগত নির্বিচারত্বে নিয়ে যান না, সেখানে প্রান্ত-অনুপ্রাসকে গেঁথে দেন স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্তবকের গঠনকে অটুট রাখবার কাজে। অথবা প্রতিপদ বাক্যের প্রথমাংশের সঙ্গে পরবর্তী অংশের অবিচ্ছিন্ন-অন্বয় তৈরী করেন। এক বাক্যের সঙ্গে পরবর্তী বাক্যের সংযোগকে করেন মূর্ত—যে-অর্থে সমুচ্চয়ী অব্যয়ের প্রাচুর্য বেড়ে যায়। এসবেরই কার্যকারণে নিহিত আছে সেই ভাবনা—যেখানে তিনি বলেন রূপের প্রাণস্বরূপের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য থাকে জটিল চিত্রকল্পের উপস্থিতি, আর রূপনৈপুণ্যই চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটায়। বিপরীতক্রমে আত্মনিবেদনকে যেমন তিনি কবিতায় আবেগাশ্রিত

করেই অস্বীকার করে যান—যাকে বলা যেতে পারে নাবাচক আবেগক্রিয়া, স্বাচ্ছন্দ্যকেও তেমনি ভাবে পরিহার করেন শব্দ প্রয়োগের কাঠিন্যে। ব্যাকরণের শাসন মান্য করেও তাঁর কবিতা সর্বদাই অন্বয়ের শাসন থেকে মুক্ত।

সুধীন্দ্রনাথ অবশ্যই অবহিত যে, স্তবকের সঙ্গে অন্ত্যমিলের নিগূঢ়-যোগটি কোথায় পাওয়া যেতে পারে, শব্দানুষঙ্গ সে-লক্ষ্যেই প্রযুক্ত হয়েছে সংকেত নির্ভরতায় ও ভাষা-ধর্মের আভাসময়তায়—যদিও তা আপাত-রূপে দুরূহ বলেই প্রতিভাত হয়। প্রসঙ্গত, বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করলে মনে হয় যে, প্রতীকবাদের ধারণা তিনি হয়তো বা চিত্রকল্পে আবেগের সাংকেতিক-নির্মাণকে খুঁজেছেন। আবেগটিকে আমরা উৎস-সূত্রে রোমান্টিকতাজাত বলেই স্বীকৃতি দেই—যার উদ্ভব ঘটেছে মর্বিডিটি থেকে, আবার পরিবেশনগত ক্ষেত্রে তিনি ক্লাসিক তথা নৈর্ব্যক্তিকতার পোষক—এজন্যেই তাঁকে মনে হয় একই সঙ্গে বিমুগ্ধ ও তিক্ত। স্তবকের স্থাপত্য অক্ষুণ্ণ রেখে তার মধ্যে তীক্ষ্ণ, অনৃজু—নানা নিরীক্ষণকে এই সূত্রেই তিনি অনুস্যূত করে দিতে সক্ষম হন।

আবার ছন্দগত-রূপে চেয়েছেন প্রবহমান, অন্তর্বাহী আবেগের নির্বাসন। সেক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে objective correlative বা unified sensibility-র প্রতি মনোযোগ। এ-দুই আবার নিবিষ্ট হয়েছে কথ্যচ্ছন্দের ধ্বনিগুণ সমৃদ্ধ, শব্দরূপগত অবিকৃতির প্রতি। সুধীন্দ্রনাথই তুলনা-মূলকভাবে তার কবিতাকে ক্রিয়া-অব্যয় পদের নিহিত-তাৎপর্যে যথোচিত রূপ দিতে সমর্থন হয়েছেন—কাব্যের অনির্বচনীয়তার মূল হিসেবে যেহেতু তাঁর চিন্তায় জাগরূক ছিল শব্দের আবেগকে কিভাবে ধ্বনি ও ছন্দের শোভনতায় ধরা যেতে পারে। একেই তিনি অভিহিত করেছেন 'রূপ'—নামে। পৌরাণিক শব্দানুষঙ্গ এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ এর মধ্যে ধ্বনিগুণ ও অর্থগুণ—উভয়ের সংযোগ পরম্পরাটি খুব বেশী আতীব্র, সংসক্তময় থাকে। তাই তৎসম ওজঃ গুণসম্পন্ন পৌরাণিক অনুষঙ্গের সুপ্রচুর দৃষ্টান্তে তাঁর কাব্যদেহ বিনির্মিত।

আবার ব্যক্তিক অনুষঙ্গ সঞ্চারের ব্রতে তিনি ব্যবহার করেন একার্থ-বোধক শব্দাবলী; তাতে প্রচলিত কোন অর্থ যেন শব্দকে লাঞ্ছিত না

করে—এ ভাবনাটিও ছিল বিশেষ ভাবে সক্রিয়। ফলে সুধীন্দ্রনাথের শব্দানুষঙ্গ সর্বদাই চেয়েছে শব্দের অতিসংহত বিরল-মাত্রিক ব্যবহার থেকে উৎপন্ন মন্ত্রগুণকে কবিতায় চারিয়ে দিতে—ফলে বস্তুর প্রত্যক্ষ বর্ণনা করেন না, মিথের পুরো আখ্যানও ধৃত হয় না, বস্তুর অন্তঃসারকে, প্রতীকিত অর্থকে প্রথমেই সুধীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। বস্তুজগতের সঙ্গে অতিসূক্ষ্মভাবে জড়িত থাকে যেসব সংকেত, সেসব সংকেতই কবির হাতে উদ্ধৃত হয়। অর্থাৎ অনুষঙ্গই কবিতার অবয়ব হয়ে উঠে। কারণ সুধীন্দ্র-কবিতায় শব্দক্রীড়া বস্তুব্যনির্ভর—ব্যঞ্জনানির্ভর নয়। ফলে ধ্বনিগত ক্ষেত্রেও মিথ-অনুষঙ্গ গুণবাচক-বিশেষ্যের প্রবলতায় যতোটা প্রযুক্ত হয়, ততোটা হয়না বস্তুবাচক অর্থে। কিন্তু প্রশ্ন, গুণের ক্ষেত্রেও কি শব্দ থেকে বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দেওয়া সম্ভব? তবে গুণ যেখানে পর্যবসিত হয় ব্যক্তিস্বরূপের রূপমূর্তি হিসেবে, অনুধ্যান হিসেবে—যেমন, ত্রিশঙ্কু, দ্বৈপায়ণ, চরণচিহ্ন, ফনের দিবাস্বপ্ন, কৃষ্ণচূড়া, কল্পতরু, হিরন্ময়—ইত্যাদি, সেখানে মিথই কবির উপাদান হয়ে ওঠে, আর মিথের ধর্মই হলো বস্তু থেকে গুণকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটি রূপক গঠন করা, প্রসঙ্গকে ভিন্নতাৎপর্যের মুখোশে আবৃত করা।

ফনের দিবাস্বপ্নের প্রতীকী-রূপকল্প কিভাবে গুণবাচক ইঙ্গিতময়তায় আত্মগঠিত হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত 'সঞ্চয়' কবিতাটি (দ্রষ্টব্য, 'অর্কেস্ট্রা' কাব্য)। এখানে ফনের দিবাস্বপ্নের মতই মধ্যাহ্নের অলসপ্রহর, মর্মরিত দেওদারবন, মুখর নদীতট, সঙ্গীনীদের স্নানরত জলকেলি, ফনের তীব্র হতাশা ইত্যাদি বিলোড়িত। এবং একটি পরিমণ্ডলের ভাবাবহ তৈরীতে সংক্রমিত। মিথকে অনুষঙ্গের ভূমিকায় অবতীর্ণ করাবার এ সূত্রকেই বলা হয়ে থাকে থীমের রূপান্তরণ-প্রক্রিয়া। এটা কিভাবে ঘটে? সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কালচেতনাকে ত্রিকালবিস্তৃত বলে যখন ভাবেন, তখন বিংশ শতাব্দীর নায়কনায়িকারা মিথের সারূপ্যে, আভিজাত্যে, অনন্যত্বে বিমণ্ডিত হয়—এটা তিনি করেন আবেগ প্রবাহ দিয়ে নয়, প্রবল যুক্তিকাঠামো দিয়ে, মিথকে আত্মোপলব্ধির শর্তে এক ধরনের অবিচ্ছিন্নতায় তাদের সঙ্গে অন্তর্লীন করতে চান। কিন্তু আশ্চর্যভাবে তিনি কখনোই মিথের লজিক্যাল-গ্রন্থনা বা কাঠামো গ্রহণ করেন না, তাঁর কাব্যিক তথা নান্দনিক-বিন্যাসকেই অন্তঃশীল করেন—যার মধ্য দিয়ে মিথের প্রতীকী-

প্রয়োগ ও অনুষঙ্গমূলক ব্যবহার সিদ্ধ হয়। বিষ্ণু দে কিংবা জীবনানন্দ দাশ যেখানে মিথকে চেতনা ও শিল্পের যৌথত্বে রূপান্তরিত-তাৎপর্যের মধ্যে ক্রমাগতই রচনা করেন, সেক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর মননক্রমে মিথকে ধারণ করেন মাত্র—কখনই দ্ব্যর্থক হননা, এমনকি একই বক্তব্যে বহু চেতনার প্রবেশও তাঁর কবিতায় একটি মিথের পাশে অনুরূপ মিথটিকেই সন্ধান করে নেয়—যযাতির দ্যোতনায় ফনের দিবাস্বপ্ন যথার্থ হয়, সোহংবাদের প্রকল্পে আসে নার্সিসাস। ইউলিসিস-সাইরেন-অনুষঙ্গে ধারণ করেন আত্মরূপকের বিচরণক্ষেত্র। ফলে মনে হতে পারে, সুধীন্দ্রনাথ মিথকল্পনাকে অনেকের মতোই ভেঙেছেন; তবে তাঁর প্রাকরণিক-সূত্রটি হচ্ছে, মিথের আর্কেটাইপকে ক্রমবিকাশশীল যৌক্তিকতায় বিধৃত করে কিভাবে তাতে আপন থীমের প্রতিপাদন ঘটানো যেতে পারে। এবং এটা ঘটে বিচিত্র পদ্ধতিতে—যেমন ঈশ্বরের নশ্বরত্ব প্রমাণিত হয় কখনো যাযাবরের আর্যবিধাতা, য়িহুদির হিংস্র ভগবান, লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহারে। কিংবা 'উপসংহার' ('সংবর্ত' কাব্য) কবিতায় বারাণসীর চিত্র আভাসিত রেখে তিনভাণ্ডেশ্বর শিব ও বিশ্বেশ্বর মন্দিরের শাশ্বতদ্যোতনা অর্থাৎ সিদ্ধরসকে চূর্ণ করেন। অর্থাৎ তিনি মিথের স্বতঃসিদ্ধ রূপটি উল্টিয়ে দেন—এর বড় দৃষ্টান্ত 'তন্বী' কাব্যের 'উর্বশী' কবিতায় বিধৃত উর্বশীর প্রতিমূর্তিটি। তাঁর মিথপ্রযুক্তির ধারাটি যে ক্রমেই ব্যাখ্যামূলকতা থেকে প্রতীকময়তায় এগিয়েছে—এটা পূর্বেই আমরা লক্ষ করেছি। এবং ক্রমেই তিনি মিথকে ঐতিহ্যিক—সূত্রে—সামূহিক-চৈতন্যের সংস্কারে বিমণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন বলেই প্রতিভাত হয়, কারণ তিনি সেই নান্দনিক ধারণায় প্রত্যয়ী, যেখানে বলছেন, "নূতনত্ব ব্যতীত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও যেমন শক্ত, তেমনি আগাগোড়া "নূতনত্বের সাহায্যে তার চৈতন্য জাগিয়ে রাখা অসম্ভব এবং শিল্পসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনমাত্রাকে বিশ্লেষণ করলেই প্রাচীন অর্বাচীনের নিপুণ সংমিশ্রণ চক্ষে পড়বে।"[১৭] এই সংমিশ্রণ-লক্ষ্যই কবিতায় রূপের সামার্থ্য রচনা করে, সে-সঙ্গে মিথেরও। কেননা মিথ বা মহাকথায় নিহিত থাকে রূপবন্ধের নানাবিধ উপাদান—চিত্রকল্প, অনুষঙ্গ, রূপক-উৎপ্রেক্ষা; যা যে-কোন কালের কবিকেই প্রলুব্ধ করে থাকে। শিল্পসাহিত্যে মিথের প্রয়োগ-ইতিবৃত্ত তাই যেমন অব্যবহিত, অন্তঃপাতী, তেমনই নান্দনিকতায় সংবেদনশীল—ব্যক্তি ও সংস্কৃতির অবৈকল্য ধারণে অব্যর্থ।

তথ্য-সঙ্কেত

১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কার্তিক ১৩৯০, অমিয় দেব-সম্পাদিত।

২ দ্রষ্টব্য—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মন্তব্য—"একাধারে স্টোয়িক ও এপিক্যুরিয়ান কবি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের বিদগ্ধ মুখখণ্ডনের ছলা-কলা যতই ইন্দ্রিয়সুভগ হোক সেখানেও কবিতা ও গদ্যে একটি অভিন্ন অবিভক্ত মনন অসামান্য অথচ একমুখী সার্থকতায় শিল্পায়িত হয়েছে।" 'আধুনিকতার সংজ্ঞা', আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৮৩, পৃ ১০

৩ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, পূর্বোক্ত।

৪ ঐ

৫ ঐ

৬ ঐ

৭ "প্রতীক অন্বেষণের সমস্ত বৃত্তান্তটা পাঠকের সামনে উপস্থিত করার কোনো বাধ্যবাধকতা কবির নেই।" সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্য, দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র, নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত 'সুধীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সংকলিত, ১৯৭৫, পৃ ২৩৯

৮ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩৭

৯ ঐ, পৃ ২৩৮

১০ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ, পূর্বোক্ত।

১১ ঐ

১২ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩৭

১৩ দ্রষ্টব্য—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ, পূর্বোক্ত।

১৪ "চতুরায়তনিক ব্যোমে স্বনিয়ন্ত্রিত বস্তুর মত চিন্তাও চলে চক্রাকারে"। সুধীন্দ্র-ভাষ্য, দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩৭

১৫ প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ 'বিষ্ণু দে : কালে, কালোত্তরে,' ১৯৮২, পৃ ৯০-৯১

১৬ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার' : বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র ভূমিকা', ১৯৮০, পৃ ৯০

১৭ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিচয়, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৯